প্রত্নচিহ্ন-র পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ আগষ্ট, ২০২১। লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন 8942924234 এই নম্বরে। E-mail : ab.farque@gmail.com

অতীত খুঁড়ে ইতিহাস উদ্ধার

প্রত্নচিহ্ন

E-MAGAZINE

ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

দ্বিমাসিক ৪ পাতা

১ম বর্ষ - ৭ সংখ্যা ❑ ২৯ আষাঢ়, সোমবার, ১৪২৮ সন ❑ ১৪ জুলাই, ২০২১

পৃথিবীর তিনটি রহস্যময় প্রত্নকীর্তি

অভিষেক ঘোষ



(গত সংখ্যার পর)

প্রথমে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল এক দুঃসাহসী ডাচ আবিষ্কারের নজর পড়ে রাপা নুইয়ের ওপর। সেদিনটি ছিল রবিবার, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র দিন ইস্টার সানডে। সেই পবিত্র দিনটির নামেই উনি এর নামকরণ করলেন ইস্টার আইল্যাণ্ড। তিন হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত সেই দ্বীপে ডাচ দলপতি জ্যাকব রগ্গেভীন তিনটি গোত্রের মানুষের সন্ধান পান। সেই তিন গোত্রের লোক ছিল পৃথক গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট - একদল ছিল গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, আরেকদল লালচে রঙের যা রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর শেষ দলটি ছিল লাল চুলওয়ালা শ্যামলা গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট। দ্বীপটিতে তিনি আখ, কলা, ডুমুর ইত্যাদি শস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলে তাঁর লেখায় উল্লেখ আছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে বস্তুটি তিনি দেখতে পান তা হলো দ্বীপের প্রান্ত ঘেঁষে সমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো অদ্ভুত মানব চেহারা বিশিষ্ট শত শত দৈত্যাকার পাথরের মূর্তি বা মোয়াই। কঠিন আগ্নেয় শিলা খোদাই করে তৈরি এই মূর্তিগুলোর সংখ্যা ছিল ৮৮৭টি। বস্তুত দ্বীপভূমিটি তখন অনেক বেশি সবুজ ছিল। বিখ্যাত ব্রিটিশ নাবিক এবং আবিষ্কারক জেমস কুক ১৭৭৪ সালে ইস্টার আইল্যাণ্ডে গিয়ে দেখতে পান, অল্প সংখ্যক মূর্তিই তখন দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে। বেশিরভাগ মাটিতে শায়িত অবস্থায় পড়ে আছে দ্বীপের চারদিকে, কিছু অর্ধনির্মিত আর কিছু ছিল মাটিতে আংশিক বা পুরোটাই প্রোথিত। এখন প্রশ্ন হলো কারা এই দ্বীপে এত বিশাল বিশাল মূর্তি তৈরি করেছিল? কৃষক শ্রেণির পলিনেশিয়ানরা কি সত্যিই এত ভালো খোদাইকর ছিল? সেখানে যদি না তৈরি হয় তবে তা সুদূর জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপে কীভাবে এলো? কারা নিয়ে এসেছিল সেই টন টন ওজনের মূর্তি? নাকি নিজেরাই যে সব আবিষ্কার করেছিল? নাহ্, এর কোনো সঠিক উত্তর আজও মেলেনি। উত্তর রয়ে গেছে অজানা আর তা জানার জন্য আজও চলছে বিস্তর গবেষণা।

লোকবিশ্বাস দুরকম, একদল মনে করে, এ হলো ভিনগ্রহবাসীর কাজ। তাদের এমন ধারণার পেছনে ছিল রাপা নুই দ্বীপে আবিষ্কৃত কিছু শিলালিপি যা 'রোংগো-রোংগো' নামে পরিচিত, আর পাথরের গায়ে স্পেস স্যুট পরা বেশ কিছু হাতে আঁকা ছবি। সে সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জনগণ লিখতে জানত না। তা হলে কি করে সেই জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপ 'রাপা নুই'-এর লোকেরা লিখতে শিখেছিল। তাদের সে লেখার পদ্ধতি ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। লেখাগুলির অর্থ আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে, কে তাদের লিখতে শিখিয়েছিল? কোথা থেকে তারা এই অভিনব লেখা শিখে এসেছিল? এমন লেখা তো পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে দেখা যায় না। প্রশ্ন উঠে তা হলে কি সেই ভিনদেশি

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

আসফ-উদ-দৌলা : অওধের এক খেয়ালী নবাব

ফারুক আব্দুল্লাহ

(গত সংখ্যার পর)



বলা হল যে নবাবের ডাল খেতে ইচ্ছে হলে তাকে একদিন আগে জানাতে হবে এবং ডাল রান্নার সাথে সাথেই সমস্ত ব্যস্ততা ফেলে খেতে আসতে হবে নবাবকে। এই ঘটনার একমাস পর নবাবের আদেশে বাবুর্চী ডাল রান্না শেষ করে এক বার নয় তিনবার খবর পাঠান নবাবকে কিন্তু নবাবের আসতে দেরি হওয়ার বাবুর্চী সমস্ত ডাল ফেলে দিয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যান। পরে এখবর শুনে নবাবের ভীষণ অনুশোচনা হতে থাকে এবং সেই বাবুর্চীর খোঁজ শুরু হয় কিন্তু শত খুঁজেও তার খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

নবাব আসফ-উদ-দৌলার উদারতার আরও অনেক নির্দশন পাওয়া যায়। ১৭৯০ সালে একবার নবাব আসফ-উদ-দৌলা গৌরক্ষপুরে শিকারে এসে গৌরক্ষনাথ ও বিখ্যাত সুফি পীর রৌশন আলী শাহর কাছে আশীর্বাদ নিতে যান। বিখ্যাত সুফি রৌসান আলী শাহ তখন একটি ইমামবাড়া নির্মাণ করার জন্য নবাব আসফ-উদ-দৌলা -র কাছে কিছু জমির আবেদন করলে নবাব তা মঞ্জুর করেন। এরপর নবাব টোডরমল নির্মিত গৌরক্ষনাথ মঠে যান এবং মঠের সৌন্দর্য বৃদ্ধির আদেশ দেন। সেই সাথে মঠকে প্রচুর করহীন ভূমি দান করেন জাগীর হিসেবে।

নবাব আসফ-উদ-দৌলা ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবাবী পৃষ্টপোষকতায় প্রতি বছর খুব ধুম ধামের সঙ্গে বেশ কয়েকটি হিন্দু উৎসব পালিত হতো। এরমধ্যে অন্যতম ছিল হোলি বা 'ইদ-এ-গুলাবি'। এই দিন নবাব সহ দরবারের বাকিরাও মেতে উঠত এই উৎসবে। এদিন হলুদ ঘুড়ি ওড়ানো হত। নবাব সহ বাকি সভাসদরাও হলুদ পোষাক পরে সুফি দরগায় প্রার্থনা করতে যেতেন এবং প্রার্থনা শেষে শুরু হত রং খেলার ধুম। নবাবের রঙ খেলার বর্ণনা বিখ্যাত উর্দু কবি মীর তাকি মীরের লেখাতে ফুটে উঠেছে, 'হোলি খেলে আসফ উদ দৌলা উজির, রঙ সহবত সে আজব হে খুর্দ ও পীর'

অর্থাৎ তিনি এমনভাবে হোলি খেলছেন যে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই তা উপভোগ করছে। এছাড়াও নবাব আসফ-উদ-দৌলা ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান ও বইপ্রেমী নবাব। তিনি বই পড়তে এবং বই সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন। নবাবের প্রাসাদে নবাব একটি 'কিতাব খানা' খুলেছিলেন এবং তিনি সেখানে নানান বিষয়ে লেখা দেশ-বিদেশের প্রচুর বই সংরক্ষণ করতেন।

নবাব আসফ-উদ-দৌলা তাঁর উদারতা ও মহানুভবতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন সমগ্র অওধ রাজ্যে এবং সমগ্র দেশেই। এই দানবীর নবাব সম্পর্কে অওধের মানুষের মুখে মুখে একটি প্রবাদ ঘুরত *'জিসকো না দে মওলা উসকো দে আসিফ-উদ-দৌলা'* এই প্রবাদটির কথা একদিন নবাবের কানে পৌছলে তিনি অত্যন্ত লজ্জা পান এবং প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে "আপনারা কিভাবে মওলার উপরে আমাকে স্থান দিচ্ছেন?" এটা অন্যায়। আসলে সবকিছু তো দেয় মওলা নিজেই। আমি হয়ত তার মাধ্যম মাত্র। তাই যদি বলতেই হয় তবে বলুন *"জিসকো দে মওলা উসিকো দে আসিফ-উদ-দৌলা"*। কিন্তু নবাবের শুধরে দেওয়া এই প্রবাদটির খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি। মানুষ পুরানো প্রবাদটি আওড়ে আজোও নবাবকে স্মরণ করে।

(শেষ)

সম্পাদকীয়

আশা করি সবাই কুশল আছেন। আসলে সময় চারিদিকে এখনো ভালো নয়। পৃথিবী নিজেকে সারাতে এখনো ব্যস্ত। তারমধ্যেই আমাদের ভালো থাকতে হবে। তারমধ্যেই সময় বের করে আমাদের ঐতিহ্যকেও বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। মহামারীর কারণে জেলার বেশীরভাগ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এখন বন্ধ। ফলে দর্শনার্থীও যেমন নেই, তেমনি রক্ষণাবেক্ষণের হালও তথৈবচ। জঙ্গল কাটা, বাগান দেখাশোনা এবং স্থাপত্যের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে বহু জায়গায় হচ্ছে না। এবিষয়ে আমাদেরও সচেতন হতে হবে। কিছুদিন আগে নবাব নাজিম সরফরাজ খানের সমাধি সৌধ রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। এগুলো যেন না হয়। আমাদের মাথায় রাখতে হবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করার কোন অধিকার আমাদের কারোর নেই। আসুন আমরা সবাই মিলে ঠিক করি যে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বিনষ্ট হতে দেবনা। হতে দেখলে প্রতিবাদ করবো এবং তাকে বাঁচানোর জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করবো। সরফরাজ খানের সমাধির মতোই নবাব ওয়াসেফ আলী মীর্জার সাধের পাহাড় বাগানের পাশে ময়লার স্তূপ। পাহাড়ের অবস্থাও ভালো না। নিজামত কেল্লার ভিতরে বহু জায়গা দখল হয়ে গেছে। এগুলো নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। এভাবে জাতীয় সম্পদ দিনের পর দিন অবহেলায় নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোকে বাঁচনোর জন্য। রত্নেশ্বর মন্দির, রেসিডেন্সিয়াল সমাধির অবস্থাও যথেষ্ট হতাশাব্যাঞ্জক। হেস্টিংসের স্ত্রী ও মেয়ের সমাধিও পড়ে আছে, নামমাত্র দেখাশোনা হয়। কাশিমবাজার বড় রাজবাড়ী ধ্বংসের প্রহর গুনছে। এগুলো মেনে নেওয়া যায় না। আসুন আমরা সবাই মিলে এগুলোকে বাঁচানোর প্রয়াসে একজোট মিলে কাজ করি। আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচানোর দায় কিন্তু সবার আগে আমাদেরকেই নিতে হবে। তবেই আমাদের ইতিহাস বেঁচে থাকবে যুগান্তর ধরে।

রেশম কথা

(গত সংখ্যার পর) **নিত্যগোপাল মণ্ডল**





অধ্যাপক সৈমেন্দ্র কুমার গুপ্ত এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইউরোপীয় বাণিজ্যের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ফল ছিল জেলাঞ্চলে শিল্প উৎপাদনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। এই বাণিজ্যের ফলে রেশম শিল্পের সামনে খুলে গেল এক বিশাল বাজার সেখানে ক্রেতারা বিপুল অর্থের বিনিময়ে কৃষক ও হস্তশিল্পীদের জোগান দেওয়া যেকোন পরিমাণ দ্রব্যাদী কিনতে প্রস্তুত ছিল এই সব হস্তশিল্পীদের অনেক সময় আগাম দিয়েও উৎপাদন করিয়ে নিত বণিকরা। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইউরোপ থেকে কাপড় রঙ করার ও সুতো পাকানোর উন্নততর পদ্ধতি নিয়ে আসে। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে 'বড়পলু' নামক পোকা আমদানী করা হয়। সুতো পাকানোর উন্নততর পদ্ধতি শেখানোর জন্য ইতালী ও অন্যান্য দেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা হয় এবং ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জেলাঞ্চলে কাঁচা রেশম উৎপাদনে ইউরোপীয় পদ্ধতি বিশেষত ইতালীয় 'ফিলেচার পদ্ধতি' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে লাগে। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে এই শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় ফলে রেশম বস্ত্র মধ্যবিত্তদেরও নাগালে আসে।

টেভারনিয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, ১৬৬৬ খ্রীঃ কাশিমবাজারে কাঁচা রেশমের উৎপাদন ছিল ২.৫ মিলিয়ন টন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২২০০০ গাঁট কাঁচা রেশম রপ্তানী হয়েছিল কাশিমবাজার থেকে। তাঁর হিসাব অনুযায়ী সেই সময় কাশিমবাজার ও তার সন্নিহিত অঞ্চল সমূহের সম্মিলিত রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন পাউণ্ড। এর মধ্যে ২.২ মিলিয়ন পাউণ্ড রপ্তানী হত। রেশম বাণিজ্যের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্যকে উৎসাহ দানের নীতি গ্রহণ করে ও কাশিমবাজারে বিনিয়োগের জন্য আশি হাজার পাউণ্ড বরাদ্দ হয়। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে বরাদ্দ বেড়ে হয় ১,৪০,০০০ পাউণ্ড। কালক্রমে এই বিনিয়োগ

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

ভারতের কঙ্কাল দ্বীপ

(গত সংখ্যার পর) **অর্ঘ্য দীপ দাস ও সোমেশ মাইতি**



এমনকি ডি.এন.এ. পর্যন্ত একদম ঠিক আছে। এরপর ২০০৪ সালের একটা গবেষণা হয়। সেখান থেকেই উঠে এল এক অদ্ভুত খবরর। এই কঙ্কালগুলো প্রায় ৮৫০ খ্রিষ্টপূর্ব আগেকার। ডি.এন.এ. রিপোর্ট থেকে এটা বোঝা যায় যে কঙ্কালগুলো অনেক দলে বিভক্ত ছিল। তবে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে স্থানীয় বেশভুষার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কঙ্কালের সাথে বাঁশের লাঠি বা চামড়ার জুতো ইত্যাদি জিনিসপত্র পাওয়া যায়। যার থেকে মনে করা হয় এরা চাকর, কুমোর, মুচি বা জেলের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এই সমস্ত মানুষজন কোনো তীর্থযাত্রীর দল। কাছাকাছি অবস্থিত কোনো এক দেবীর উদ্দেশে তীর্থে যাচ্ছিল।

প্রত্যেকটা লোকই একইরকম ভাবে মারা যায়। প্রত্যেকেই মারা যায় মাথায় আঘাত পেয়ে। কিন্তু আঘাতের চিহ্ন থেকে এটা পাওয়া যায় যে কোনো অস্ত্র দ্বারা এরা আঘাত পায়নি। কারণ এই ক্ষতগুলো গভীর হলেও খুবই ছোট ছিল। তবে প্রতিটা কঙ্কালেরই আঘাতের চিহ্ন শুধু মাথাতেই পাওয়া যায় তা নয়। কিছু কিছু কঙ্কালের ক্ষেত্রে অবশ্য কাঁধেও আঘাতের দাগ পাওয়া যায়। অনেক গবেষণার পর জানা গেছে এদের মৃত্যু খুব আচমকাভাবে হয়েছে। এরা যখন এপথ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন আচমকা তুষারপাত হয়। যাওয়ার পথে বিপদে পরে পালানোর পথ পায়নি। বরফের বড়ো বড়ো গোলা এদের মাথায় আঘাত করে আর সেখান থেকেই এদের মৃত্যু হয়। বরফের গোলাগুলোর আকার প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার ছিল আর তারপর থেকেই এরা প্রায় ১৫০০ বছর ধরে পরে আছে প্রকৃতির কোলে।

এদের পরিচয় কিছু জানা না গেলেও জীনের অস্তিত্ব থেকে এটা বোঝা যায় যে এরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার-ই বাসিন্দা। এরা ভারত, নেপাল, মায়ানমার বা চীন থেকে আগত যাত্রী। *(শেষ)*

একটি মৃতপ্রায় নদীর আর্তনাদ

সঞ্চয়িতা সরকার



যদি দেখি নদীর ইতিহাস, তার সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ লক্ষ কালের ইতিহাসে অনেক মিলিয়েও গেছে, শুষ্ক করিয়া বক্ষ। অনেকেরই স্থান আছে ইতিহাসে, অনেকের বা নেই, এদেরও আমরা ফিরে পাবো, সমীক্ষা করবো যেই। 'Memories of Moribound River', নাম দিয়েছি তাই, যা বলি শোনো এখন, অন্য কথা নাই। বাংলা তো নদীমাতৃক দেশ, নদী তার জীবনের সব, নদী যদি শুকিয়ে যায়, তবে হবেই কলরব। নদীর মাছ ছিল খাদ্য, যা শরীরে যোগাবে প্রোটিন, নদী পথে যাতায়াত, এটাই ছিল রুটিন। বসতি ছি তাকে ঘিরেই, ছিল বাণিজ্য তথা, আজ আমি বলছি এখন মুর্শিদাবাদের নদীর কথা। হারিয়ে গেছে অনেক নদী, অনেকের বা ঢেউ, ইতিহাসে আঁকড়ে আছে, মৃত্যুর প্রহর গুনছে কেউ কেউ। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন নদ, ভৈরব নাম তার একখান হয়েছে পূর্বেই লীন, জীর্ণ তার জলাধার। মহানন্দা ও পদ্মা যেথায় মিলিত হয়, ঠিক তার বিপরীতে, পদ্মা থেকে উৎপত্তি, এমন কথা কয়। জেনেছি আমি পূর্বে এটি ছিল লালগোলা থানার অন্তর্গত পদ্মার মূলধারা যখন গঙ্গা ছিলনা, মহানন্দা এই এছাড়া প্রবাহিত হতো। পরবর্তীতে পদ্মা রাণী, আসেন ভৈরবেতে, তবে পদ্মা এখনো পুষ্ট হয় মহানন্দাতে। এরই খাত বরাবর প্রবাহিত হয় ভৈরব, তখন জল গেল কমে, হ্রাস পেলো নদের গতি, জেনেছি লোকমুখে শুনে। এই কথা ছিল

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

ইতিহাসের আলোকে কাশীরাম দাস

রিয়া দাস (রাই)



বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাভারত অনুবাদে কাশীরাম দাস শ্রেষ্ঠ। কাশীরাম দাস বা কাশীরাম দেব মধ্যযুগীয় সপ্তদশ বাঙালি কবি। তিনি সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারত বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনুদিত গ্রন্থ 'ভারত পাঁচালী' বা 'কাশীরাম সংহিতা' যা আজ বাংলায় 'মহাভারত' (কাশীদাসী মহাভারত) নামে পরিচিত। তাঁর অনুদিত মহাভারত-ই-বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয়।

খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতকে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম বর্তমানে ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কাশীরাম দাস বলেছেন —

''কায়স্থ কুলেতে জন্মবাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস সুত সুধাকর নাম।।
তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।।

মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশীরাম দাস পথিকৃৎ নন। কারণ এর আগে আমরা পেয়েছি কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, গঙ্গা দাস সেন, নিত্যানন্দ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজনকে। ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে উইলিয়াম কেরীর উৎসাহে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কলঙ্কারের সম্পাদনায় কাশীরাম দাসের নামে ৪ খণ্ডে সমগ্র মহাভারত প্রকাশিত হওয়ায় মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশীরাম দাসের নাম সার্বভৌম অধিকার স্থাপন করে।

কাশীরাম দাস কোন সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। কবিকঙ্গণ, কৃত্তিবাস ইত্যাদি রচনার থেকে কাশীরাম দাসের রচনা আধুনিক। কারণ কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ এর ভাষার তেকে কাশীরাম দাসের ভাষা অনেক অংশে মার্জিত, স্পষ্ট ও সরল এবং শব্দগত বৈষম্য ও রয়েছে। কাশীরাম দাস কায়স্থকুলোত্তব এবং তাঁদের 'দেব' উপাধি ছিল। কায়স্থ জাতিরা উপাধির আগে 'দাস' বলে উল্লেখ করেন। কাশীরাম দাস ও মহাভারতের কোথাও 'দেব', আবার কোথাও 'দাস' উল্লেখ করেন —

''শান্তিপর্ব ভারতের অপূর্ব কখনে।
কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দ চরণে।।''

কাশীরাম দাস ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য অতিশয় সরল অন্তঃকরণে লিখেছেন —

''মস্তক বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরা গ্রজ।।''

কাশীরাম দাসের পিতার নাম কমলাকান্ত, পিতামহের নাম সুধাকর এবং প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর ছিল। কাশীরাম দাসের দুই সহোদর। কৃষ্ণদাস জ্যেষ্ঠ, কাশীরাম মধ্যম ও গদাধর কনিষ্ঠ। কিন্তু অনেকে বলেন কমলাকান্তের চারটি পুত্র। তার মধ্যে কাশীরাম তৃতীয়। কিন্তু এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই।

মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি এবং শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস বর্ধমান জেলার গৌরব। কোন কোন পুঁথিতে কাশীরাম তিনটি পর্ব, কোথাও চার পর্ব, কোথাও সাড়ে তিন পর্ব, কোন পুঁথিতে মহাভারত রচনার কথা বলা হয়েছে। একটি পুঁথিতে আছে

— *(ক্রমশ)*

বর্ধমান জেলার কয়েকটি পথের কথা

রাতুল দে

(গত সংখ্যার পর)



গৌড় - গড়মান্দারণ পথ ঃ— গৌড় (রংপুরের কাঁটাদুয়ার) থেকে গড়মান্দারণ (হুগলী জেলা) পর্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রাচীন পথ আছে। পথটিকে বলা হতো 'বাদশাহী সরান' এই পথের দুই পাশে একদা ছিল হাঁক অন্তর দীঘি, মসজিদ ও সরাইখানা। বর্তমানে মসজিদ ইত্যাদি ভগ্ন ও বিলুপ্ত। দীঘিগুলি এখন আছে। এই পথটি হুগলি জেলা থেকে, বর্ধমান জেলার রায়না থানায় বর্ধমানে ঢুকেছে। তাদের সদর, ভাতার, মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম থানা হয়ে প্রবেশ করেছে মুর্শিদাবাদে। জনশ্রুতি বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩ - ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) এই পথ তৈরি করেছিলেন। তিনি উড়িষ্যায় যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে পীরস্থানে কোন এক পীর তাকে স্বপ্ন দেখায়, গৌড়ে গেলেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাই সুলতান পথ তৈরি ও দিঘী কাটাতে কাটাতে অগ্রসর হন।

কিন্তু বাস্তবে এই পথ আলাউদ্দিনের রাজত্বের আগেও ছিল। বাংলার সুলতান রুকুন - উদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯ - ১৪৭৪) আমলে এই পথ ছিল বলে জানা যায়। ইসমাইল গাজী নামে সুলতান বারবক শাহের এক কর্মচারী ছিল। সে ছিল গড়মান্দারণের শাসক। তাঁর প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন সুলতান বারবক শাহ। তাঁর মরদেহ গৌড় থেকে গড়মান্দারণ আনা হয়েছিল। যেখানে যেখানে ইসমাইল গাজীর শববাহকগণ বিশ্রাম নিয়েছিল, সেখানে সেখানে পড়েছিল রক্ত। তাই সেই স্থানে তৈরি হয়েছিল পীরের মাজার। এই পথের দু'ধারে এমনি প্রচুর মাজার আছে। রূপরাম ও ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে এই পথের উল্লেখ আছে।

বর্ধমান-কাটোয়া সড়ক - বর্ধমান কাটোয়া সড়কটি খুব প্রাচীন। এই পথ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল বলে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে জনশ্রুতি। কাটোয়ার থেকে নরজার কাছে গিয়ে, উক্ত গৌড় - গড়মান্দারণ সড়কে মিশেছে। এই পথ ধরে কাটোয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুণ্যার্থীরা একদা গড়মান্দারণ হয়ে গড়মান্দারণ - পুরী পথ ধরে জগন্নাথ দর্শনে যেতো।

নবাবী আলীবর্দী খান একদা স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বর্গীদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে কাটোয়া এসেছিলেন। মহারাষ্ট্র পুরাণে তা উল্লেখ আছে। এই পথের উপর ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে কর্জনা ও নরজাতে ঠেঙাড়েরা থাকতো।

প্রবাদ ঃ যদি পেরুলি নরজা।
নেয়া ধুয়ে ঘর যা।
যদি না পেরুলি নরজা।
তো দল চাপা দিয়ে ঘুম যা।।

এই পথে একদা উটের গাড়ি

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

▶ ৩ পৃষ্ঠার পর

বর্ধমান জেলার কয়েকটি পথের কথা

চলতো। কাটোয়া, শ্রীখণ্ড ডাকতলা, কৈচর, শিমুলিয়া, বলগোনা, ভাতার ও কর্জনায় ছিল চটি। এইসব চটিতে উটের গাড়ি থাকতো।

বাদশাহী সড়ক ঃ— বাদশাহী সড়কের বিস্তৃতি কয়েকটি জেলার ভূখণ্ড জুড়ে যা উত্তরে মালদা জেলাঞ্চল থেকে মূলত দক্ষিণামুখী হয়ে ক্রমান্বয়ে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ইত্যাদি অতিক্রম করে মেদিনীপুর জেলাঞ্চল গিয়ে অন্য রাস্তার সাথে সংযুক্ত হয়ে ওড়িশা অভিমুখে গিয়েছে। সাধারণভাবে এই বাদশাহী সড়ককে অনেকক্ষেত্রে বলা হয় গৌড় (সুলতানি আমলে বঙ্গের রাজধানী) থেকে গড়মান্দারণ (মধ্যযুগে ইতিহাসখ্যাত দুর্গ, বর্তমান অবস্থান হুগলি জেলাঞ্চলে) রাস্তা। জনশ্রুতি অনুযায়ী ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই প্রাচীন রাস্তাটি নির্মাণ করেছিলেন সুলতানি আমলে গৌড়ের শাসক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ)। কিন্তু এই জনশ্রুতি সঠিক নয় বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মত অনুযায়ী রাস্তাটির অস্তিত্ব হোসেন শাহ সামরিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যপূর্ণ রাস্তার সংস্কার করেছিলেন। তিনি এই রাস্তার পার্শ্বে বহু স্থানে বৃহৎ আকারের দিঘী, মসজিদ, সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন যা তাঁর স্মৃতিবাহী। কালের স্রোতে সরাইখানাগুলি অবলুপ্ত, মসজিদগুলির অধিকাংশ হয় অবলুপ্ত অথবা ভগ্নস্তূপে পরিণত কিন্তু দীঘিগুলি পূর্বাবস্থায় না থাকলেও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দু'একটি দিঘী অবশ্য মজে গিয়ে জমিতে পরিণত হয়েছে।

বাদশাহী সড়ক 'লাঘাটায়'য় (বর্তমানে সদরঘাট সেতুর সামান্য পূর্বে) দামোদর নদ অতিক্রম করে রায়না থানার জামানা (৪), গ্রামে পৌঁছেছে। জামনা থেকে রাস্তাটি পূর্বাভিমুখী হয়ে বাঁধগাছা অতিক্রম করে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে। তারপরে বেলসরে (১১), শ্যামসাদবাটী (২৮), হয়ে বাদশাহী সড়ক শ্যামসুন্দরে প্রবেশ করছে। শ্যামসুন্দরের প্রবেশ পথে 'রাজার মায়ের দিঘি' এক বৃহৎ জলাশয়। 'থানা রায়নার স্থান পরিচয়' প্রবন্ধে (বর্ধমান সমগ্র প্রথম খণ্ড) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল জানিয়েছেন" এই যে পুরাতন বাদশাহী সড়ক আহার বেলমা গাঁয়ের গা ঘেঁসে চলে গেছে। শ্যামসুন্দরের পূর্বতন নাম আহার বেলমা।

কালনা রোড ঃ— রেনেলের সার্ভে মানচিত্রে বর্ধমান জেলার মধ্যে এমন বহু রাজপথ বা সাধারণ পথের পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলির মাধ্যমে বর্ধমান জেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সহ বাংলা, বিহার ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হল বর্ধমান থেকে কালনা পর্যন্ত বিস্তৃত পথ - 'কালনা রোড'। পথটি যদিও বর্ধমান মহারাজ ভেজচন্দ্র (১৭৭০ - ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে দাবি করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ পথের অস্তিত্ব ছিল তেজচন্দ্রের বহু পূর্বেই।

(ক্রমশ)

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর তিনটি রহস্যময় প্রত্নকীর্তি

গ্রহবাসীই তা শিখিয়েছিল দ্বীপবাসীকে! রাপা নুই দ্বীপ বা ইস্টার আইল্যাণ্ডের হারিয়ে যাওয়া বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা আর দ্বীপের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথুরে মূর্তি নির্মাণের ব্যাপারটি সত্যি রহস্যময়। অপর দল মনে করে, পলিনেশিয়ান-রাই মোয়াই বানিয়েছে পাথরের তৈরি অমসৃণ অস্ত্র দিয়ে। আর তারা মূর্তিগুলোকে বয়ে নিয়ে যায় নি। বরং, মূর্তিগুলো নিজেরাই পায়ে হেঁটে স্ব-স্ব স্থানে পৌঁছেছিল। যে মূর্তিগুলি দ্বীপবাসীদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম ছিল, সেগুলিই কেবল পথের মাঝে উল্টে পড়ে রয়েছে। বস্তুত মূর্তিগুলিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ, ডেভিড অ্যাটেনবরো নির্দেশিত বি.বি.সি.-র জন্য নির্মিত তথ্যচিত্র The Lost Gods of Easter Island (2000), যাতে দেখানো হয়েছে বিপুল লোকবল ও সুদীর্ঘ গবেষণার পর মূর্তিগুলির স্বাভাবিক গড়ন, ফোলা পেট ও তলদেশের কৌণিক ঢাল ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে দড়ি বেঁধে সেগুলিকে হাঁটিয়ে (দুলিয়ে দুলিয়ে) নিয়ে যাওয়া সম্ভব। হয়তো সেভাবেই দ্বীপবাসীরা তাদের প্রিয় মোয়াইদের হাঁটিয়েছিল।

(ক্রমশ)

▶ ২ পৃষ্ঠার পর

রেশম কথা

বাড়তেই থাকে। বাংলা থেকে রপ্তানীকৃত এই বিপুল রেশমের সিংহভাগই উৎপাদিত হত মুর্শিদাবাদে, কিছুটা বাংলা ও বর্তমান রাজশাহীতে। বেঙ্গল সিল্ক বলতে মূলত এই মুর্শিদাবাদ রাজশাহী ও বাংলার সিল্ককেই বোঝায়। এই বেঙ্গল সিল্ক -এর টানে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজা মহারাজারাও বাংলায় পাইক, পেয়াদা, পণ্ডিত পাঠিয়ে রেশম চাষের দীক্ষা নিতেন। কথিত আছে রেশম চাষের পদ্ধতি ও ব্যবসা সম্পর্কে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মহীশূর শের টিপু সুলতান মহীশূরের তাঁতীদের পাঠিয়েছিলেন এই বাংলায়।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী জঙ্গীপুরের রেশম কুটিতে রেশম তৈরীর ফিলেচার স্থাপন করে। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত এই কুঠি একচেটিয়া কারবার চালায় বস্ত্রবয়নে কিছুটা ভাটা পড়লেও মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্প যে তার উৎকর্ষতা বজায় রাখতে পেরেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছরে কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিংহের আমন্ত্রণে বহরমপুরের দুই ভাই নীলম্বর মুখার্জী ও পীতাম্বর মুখার্জী বিশেষক হিসাবে কাশ্মীরে যান, কাশ্মীরের রেশম শিল্পের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে। ওম্যালির মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার (১৯১৪) থেকেও জেলার রেশম শিল্প সম্পর্কিত মূল্যায়ন তথ্যাদি পাওয়া যায়। জানা যায় যে, তখন তুঁত চাষ ও পশুপালন হত প্রধানত কান্দি মহকুমার বড়ঞা থানা জঙ্গীপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানা এবং বর্তমান ডোমকল মহকুমার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত এলাকায়। বয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্র জঙ্গীপুর মহকুমার মির্জাপুর ও সদর মহকুমার হরিহরপাড়া ও দৌলতাবাদ এবং অধুনা জিয়াগঞ্জের একটি অঞ্চল বালুচর (বালুচরী শাড়ীর জন্য জগৎ বিখ্যাত) এবং ইসলামপুর।

তবে সোনার বাংলার এই সোনার রেশমের অগ্রগতিতে ভাটা পড়তে থাকে ঐ কালপর্ব থেকেই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০-১৭৭১) রেশম শিল্পের উপর চরম আঘাত হানে। বিপুল সংখ্যক হস্তশিল্পীর মৃত্যু এবং রাজধানী স্থানান্তরের ফলে রেশম শিল্পে সজ্ঞা নিয়ে আসে। আবার কোম্পানীও এই সময় রেশম বস্ত্রবয়ন এর চেয়ে কাঁচা রেশম উৎপাদন ও তা রপ্তানীতে অধিক মনোযোগী হয়ে পরায় রেশম শিল্পে কুপ্রভাব পড়ে।

"বণিকের মানদণ্ড অচীরেই দেখা ছিল রাজদণ্ডরূপে" ফলে সেই অতীত যুগের বিরাট গৌরবময় এবং ঐতিহ্যপূর্ণ গৌড়বঙ্গ তথা বাংলার রেশম শিল্প বৈদেশিক শোষণ, অত্যাচার, অনাচার এবং প্রতিযোগীতার মুখে মুমুর্ষ অবস্থায় পতিত হল।

(ক্রমশ)

▶ ২ পৃষ্ঠার পর

একটি মৃতপ্রায় নদীর আর্তনাদ

পুরনো ভৈরবের, বর্তমানে এটি বৃহৎ আকারের নালা, ইহার উৎপত্তি এখন হাসানপুর, থানা ভগবানগোলা। কি কষ্ট ভৈরবের, পদ্মা শুধুই বর্ষাতেই প্রবাহিত আজ, মুর্শিদাবাদে কিছুটা প্রবাহিত হয়ে, জলঙ্গিতে পায় স্রোতের সাজ। ইতিহাসের কথা কয় এই ভৈরব নদ, বর্তমান কি অবস্থা হায়! পূর্বে, এই পথেই মহাপ্রভু প্রতিবছর, রাজশাহীর খেতুড়িতে বৈষ্ণব সম্মেলনে যায়। বাংলার সুবাদার, মানসিংহ নাম নদীপথে গমনকালে দর্শন করেন ছাতায় গ্রামের বুড়ো শিবের ধাম। একথার প্রমাণ আছে, বলছি আমি পত্রে, সেই আমলের বোলান গানে, এর উল্লেখ আছে, প্রতি ছত্রে ছত্রে। বারো ভুঁইয়াদের অত্যাচার, বাদশা জাহাঙ্গীর দমন করতে চান, তাই বাল্যবন্ধু ইসলাম খানকে, বাংলার সুবেদার করে পাঠান। ভৈরব পথে তিনিও আসেন, একথা আজও নামে নামাঙ্কিত করেন, যা আজ ইসলামপুর।

১৭৪১, আলীবর্দী খাঁর শাসন, জানা যায় তখনই হয় বর্গীদের আগমন। পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর, কাশিমবাজার নাম, হেথায় ছিল বাংলার রেশম ব্যবসায়ী ও তাঁতিদের ধাম। বাংলায় বর্গী আক্রমণ, যখন ছোঁয় পূর্ণমাত্রা, ভৈরব পরিবেষ্টিত ইসলামপুরে তাঁতিরা করে যাত্রা। এখানেই হতো নীল চাষ, সাহেবরাও থাকতো হেথা, ভৈরব তীরবর্তী তাই, সাহেবচর নাম হয়েছিল তথা। এমন ভৈরব আজ গতিহীন, ভৈরব আজ বৃদ্ধ, এক সময় এই নদই, বাংলাকে করেছে সমৃদ্ধ। কালের নিয়ম গ্রাস করেছে, ভৈরবকে আজ, গণজাগরণই ফেরাতে পারে, ভৈরবের পুরাতন সাজ।

প্রধান সম্পাদিকা ও প্রকাশক - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), প্রত্নচিহ্ন হইতে প্রকাশিত।
উপদেষ্টামণ্ডলী - ড. অধ্যাপক রাজর্ষী চক্রবর্তী, ড. স্বপন ঠাকুর, সুবিদ আবদুল্লা, ফারুক আবদুল্লা। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)